প্রতিবাদ প্রবাদ প্রতিম

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

যতদিন পৃথিবীর বয়স ততদিন প্রতিবাদ। প্রতিবাদের বিস্ফারে মেঘ ভেঙে জল, প্রলয় ঝড়, সমুদ্রে কটাল, সুনামি, আয়লা, এক একটা বিধ্বংসী টর্নেডো, ফুসে ওঠা আগ্নেয়গিরি, ঘুমন্ত লাভার উদগীরণ, বিসুভিয়াসের অভিশাপ, প্রাকৃতিক বিরুদ্ধাচারণের অভিশাপ। কৃত্রিম মানব সভ্যতার অত্যাচারের প্রতিবাদ, আর যতদিন মানুষ ততদিন যুদ্ধ ত্রাস সন্ত্রাস হিংসা রক্তপাত ধর্মান্ধতা ধর্ষণ অন্যায় অবিচার বঞ্চনা ক্ষুধা ক্ষোভ দুর্ভিক্ষ মহামারী ভোগবাদের নয়া আস্তানা বিশ্বায়ন পণ্যায়নের এক এক অভিশপ্ত আগ্রাসমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রতিবাদ।

প্রতিবাদের পথ হাঁটাও অন্তহীন। মিছিলে স্লোগানে মশালে ফেষ্টুনে, উদ্যত মুঠিতে নিঃশব্দ মৌনতায় অনশনে ধর্নায়, মোমবাতির মৃদু শিখায় জনজোয়ারে, সাহিত্যে সংগীতে কবিতায় শিল্পকলা চিত্রে চলচিত্রে নাটকে এক এক স্বাধীন শিল্পসত্তা থেকে উঠে আসে প্রতিবাদ। সে প্রতিবাদ ছড়িয়ে যায় গণমানসে, গণপ্রতিবাদ গণপ্রতিরোধ গণকৃষ্টি গণসংগীত গণনাট্য বা গণবিপ্লবে। প্রতিবাদ তৈরী হতে থাকে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে রাজনৈতিক অরাজকতায় সামাজিক অবক্ষয়ের চুড়ান্ত অথবা মূল্যবোধ বা মানবিকতার শেষ বিন্দুও যখন তলানিতে এবং দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক উত্থান পতনে।

ব্যক্তিমানসে তৈরী এ প্রতিবাদ যা প্রতিফলিত হয় শিল্প সাহিত্য কবিতায় তখন তা সমকালকে চিহ্নিত করেই হয়। কঠিন সময়ের দগ্ধ যন্ত্রনায় মুক্তির দিশায়।

সমগ্র বিশ্বের প্রতিবাদের পটভূমিতে স্বৈরতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ; ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সভ্যতার সংকটে যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রোলা, রাসেল, মায়াকোভাস্কি, লোরকা, নেরুদা, তেমনি ভাবে দেশের এক এক সংকটকালে প্রতিবাদ উঠে এসেছে সমকালীন কবিতায়। যদিও বহু বিতর্ক রয়েছে এই বিষয়টিতে। 'শিল্পের জন্য শিল্প', 'কবিতার জন্য কবিতা' এমন ভাবনায় রয়েছে বহুমত। এই সময়ের বিশিষ্ট কবি আলোক সরকারের অনুভবে 'সমকাল কবিকে প্রভাবান্বিত করে। লোভ দেখায়। বা সহজভাবেই সমকালের প্রবণতা, প্রবণতাগুলি কবিকে আলোড়িত করে। একজন কবির আত্মচিহ্নিত হবার প্রশ্নে সমকাল জাগ্রত শত্রু, পুরনো কাল বন্ধু হলেও হতে পারে।' সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এ অনুভবের সঙ্গে দেখে নিই তার অনুভুতির কবিতা—'আমি যে দেখেছি তার বেদনাকে আমি যে জেনেছি তার হতাশাকে...।' অনুচ্চ অথচ গভীর সম্পৃক্ত এই স্বর উচ্চকিত প্রতিবাদের বিপরীতে থেকেও অনিবার্য সময় সচেতন।

এই অনুভবের পাশেই আরেক বিদগ্ধ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর উচ্চারণে সময়ের স্বর কে শুনি, পরিবর্তিত এ সময়ের স্বর, তাঁর নিজস্ব উক্তিতে 'এই যে সময়টা চলছে

এবং আবহমান্। ১৮৯৫ এডভার্ড ম্যুন্খ-এর আঁকা 'দ্য স্কিম' সিরিজের ছবি, আতঙ্কিত এক একা মানুষ অন্তহীন এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক অতলান্ত চিৎকারে ফেটে পড়ছে। সে ছবি এখন বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ গণহত্যা শিরচ্ছেদ ধর্ষণ মানববোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদ স্বরূপ এতটাই সমকালীন, যে সে ছবির নিলাম মূল্য ওঠে ৬০০ কোটিতে।

প্রতিবাদ চেতনা স্তর বিন্যাসে বহুমুখী। অন্ধকার যুগ থেকে আলোমুখী হওয়া সভ্যতার প্রথম উন্মেষ। আবার সেই সভ্যতা যখন সংকটে তখন পৃথিবীর বুকে অন্ধকার নেমে আসে যুদ্ধে সন্ত্রাসে, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে, মন্বন্তরে, অবক্ষয়ী মূল্যবোধে, বোধের বিপন্নতায়। মানুষই ঘনিয়ে তোলে এক্ অন্ধকার।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা
(অদ্ভুত আঁধার এক)

নৈরাশ্য নৈরাজ্যের এমন প্রবাদ প্রতিম পংক্তি লিখলেন জীবনানন্দ দাশ। বাংলা কবিতার পরাবাস্তব চেতনার প্রবর্তক তিনি, অথচ তাঁর চেতনায় তখন তুমুল আলোড়ন কবিতায় প্রতিবাদ স্বরূপ হয়ে মগ্নচৈতন্যে অতলস্পর্শী, বাধ্য করে আত্মসমীক্ষায়।

তিরিশ থেকে চল্লিশের দশক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রেখে যাওয়া জখমের দাগগুলি মুছে যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধেয়ে চলা সময়, এবং তিরিশের অন্তিমে সে মহাযুদ্ধ। মহামারী দুর্ভিক্ষ বিশ্বময় এক নরকীয় ঘটনার অভিঘাত দেশকালগণ্ডী অতিক্রম করে মানব চেতনায় আঘাত হানলো। নাৎসী বাহিনীর ইহুদী নিধনের নৃশংস মারণযজ্ঞ হলোকস্ট থেকে উঠে আসা ভয়াবহ হতভাগ্য হাজার হাজার মৃতের আর্তনাদ। শতাব্দী চিহ্নিত হিরোশিমার আণবিক আঘাত। যে ভয়ঙ্কর পরমাণু বিক্রিয়ের প্রায় কোটি মানুষ মুহূর্তে দগ্ধ জ্বলন্ত গলন্ত শব হয়ে গেল অথবা বেঁচে রইল আণবিক অভিশপ্ত বিকৃত প্রজন্ম হয়ে।

চল্লিশের দশক দেশের এক ঐতিহাসিক সংকটকালের সময়। রক্তপাতের, দুর্ভিক্ষের, শিকড় উপড়ে ছিন্নমুল হওয়ার, দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার, বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত সময়। যে সময়ের সংকটকাল মানুষকে গ্রাস করে নেয় অবক্ষয়ী মূল্যবোধের বিপন্নতায়। যাপন-চরিত ডুবে থাকে গতানুগতিক আচ্ছন্নতায়, ভোগ লিপ্সায়, মধ্যবিত্ত মানসিকতা যখন নৈরাশ্য সংশয়ে আবিল—

তিমির হননে তবু অগ্রসর হ'য়ে/আমরা কি তিমির বিলাসী?
আমরা তো তিমির বিনাশী হতে চাই/আমরা তো তিমির বিনাশী
(তিমির হননের গান)

শুধুমাত্র প্রবাদ প্রতিম পংক্তি নয় এ আমাদের আহত বিশ্বাস। যখনই চারপাশে অবক্ষয়, রক্তক্ষয়ে অচেনা হয়ে ওঠে সমসময়, তখন এই 'অদ্ভুত আধার' স্রষ্টার কাছে যাই সংশয় নিরসনে। যে সংশয় থেকে উচ্চারণ করি সেই অমোঘ পংক্তি—

দারুণ আলোড়িত সময়, আমার কবিতা তার অংশীদার হতে চেয়েছে।' কিছু পংক্তিতে সে অনুভূতি,

'মা তার ছেলেকে জন্মানোর আগে শেষ বার
আদর করছে, তার জন্মের পরেই তাকে ডেকে
নিয়ে যাবে মুক্তির সেনানী।'
'হাতে অরব প্রতিবাদের কালো রাখি কবির মিছিল যায়
শহর সন্ধ্যায়'

বলার অপেক্ষা রাখেনা আন্তর্জাতিক চেতনায় সমসময় কীভাবে প্রতিপাদ্য হতে থাকে এসব পংক্তিতে।

একটি দেশ রাষ্ট্র দশক কাল ইতিহাস এবং মানুষ যখন চিহ্নিত হয়ে যায় একটি দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ বা রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে, সন্ত্রাসের অগণন লাশে, তখন সমকালের শিল্প সাহিত্য অনিবার্য হয়ে ওঠে সময়ের স্বরকে আত্মসচেতনতায় জনগণমানসকে সজাগ করতে। জীবনানন্দের সেই কালাশ্রয়ী কালজয়ী প্রবাদে যা এক অভ্রান্ত ধ্রুবক—'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব...থেকে যায়...'

প্রতিবাদ যেভাবে ফরাসী বিপ্লবকে উজ্জীবিত করেছিল, বিদগ্ধ ফরাসী কবি সাহিত্যিকের রচনায়। আবার সে বিপ্লবের ব্যর্থতাও সাহিত্যে সাক্ষরিত হয়ে রয়েছে কালজয়ী উপন্যাস গল্প কবিতায়। মানবসভ্যতা ধ্বংসে।

যে ভাবে পিকাসোর গ্যের্নিকা। স্পেনের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে, ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো, হিটলার, নাৎসীর ষড়যন্ত্রে টানা তিনদিনের বোমাবর্ষণে জ্বলন্ত শহর গ্যের্নিকা। হাজার মৃত্যুর যন্ত্রণাদগ্ধ আর্তনাদ দিশেহারা মৃত্যুর ছবি এঁকেছিলেন পিকাসো। রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিল এই শিল্পীর অবস্থান কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্ত্রের এ ঘৃণ্য হত্যাদৃশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিবাদে উদ্‌ভ্রান্ত আহত তিনি এগারো ফিট লম্বা ক্যানভাস জুড়ে আঁকলেন সে বীভৎস যুদ্ধ হত্যা মৃত্যু ছবি, যা এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে আছে—যুদ্ধ প্রতি শিল্পে।

এমনি সমকালীন প্রতিবাদ শিল্পে মন্বন্তর দুর্ভিক্ষ দারিদ্র শোষণ, পরাধীনতার গ্লানি দ্বিতীয়ত বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত প্রবল আলোড়িত করেছিল ছবি এবং ভাস্কর্যকে। সোমনাথ হোড়, চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিন এঁদের প্রায় সমস্ত শিল্পকর্মই প্রতিবাদের পটভূমিতে। যে প্রতিবাদ উঠে আসে মনুষ্যত্বের বিপর্যয়ে অপমানে। যেভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস উঠে এসেছিল শাহাবুদ্দিনের তীব্র তুলির টানে, ব্রাশের আঁচড়ে, পেশী ছিঁড়ে আসা যন্ত্রণার প্রতিবাদ মুক্তির আন্দোলনে।

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসে রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশের অরাজকতায় শিল্পীর কবির ভূমিকা নির্ধারণ করে তার প্রতিবাদী সত্তার সত্যটুকু। যেখানে মিথ্যের কারচুপিতে প্রতিবাদ হয়ে ওঠে আরোপিত এবং তাৎক্ষণিক। একমাত্র আত্মিক সংযোগেই প্রতিবাদের কবিতা শিল্প সাহিত্য হয়ে ওঠে এক একটি স্ফুলিঙ্গ। যে আগুন জনমানসে জ্বেলে দেয় প্রতিবাদের মশাল। যা চিরায়ত

'পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ এখন'।

যা চারিয়েগেছে ছত্রাকের মতো সমাজের গভীর স্তরে, রাজনৈতিক ইন্ধনে, গণপ্রহারে, ধর্ষণে, আগ্রাসনে, মারণ যজ্ঞে। সংবাদ শিরোনামে মিছিলে স্লোগানে এই সব প্রবাদ প্রতিম পংক্তি-রা উদ্ধৃতির আড়ালে রক্তাক্ত হতে থাকে। সংশয় জাগে এই যে সভ্যতার আলো গায়ে মেখে জেনওয়াই প্রজন্ম বা নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যবিত্ত, শান্তিকল্যাণের জনগণ আমরা, আমরা কী অন্ধকারের বিলাস অথবা বিনাশের ফারাকটুকু মর্ম দিয়ে বুঝি?

এই নৈরাশ্য নৈরাজ্যের দশকেই তো বাংলা কবিতায় বাঁক বদলের শুরুয়াৎ। রোমান্টিকতা থেকে প্রতিবাদের প্রাত্যহিকতায় যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন—

'ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া
অখিল ক্ষুধায় শেষে নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।' (উটপাখী)

বিদেশী কাব্য কবিতে প্রভাবিত তিনি, কবিতার ধ্রুপদী বিশ্বাস থেকে সময়ের ভানুবতার আভাসকে সচেতন করলেন প্রবাদকল্প পংক্তিতে—'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

যখনই নষ্ট সময়কে চিহ্নিত করি বা অন্যায়ের প্রতিবাদে উদাসীনতাকে সচেতন করি তখনই সতর্ক প্রবাদপংক্তির শরনিক্ষেপ কি অব্যর্থ হয়ে ওঠে না!

প্রতিবাদের কণ্ঠ বদলে যায় সময়ের দাবীতে। কিন্তু তার আবেদন চিরকালীন। এক এক কবির মনন হৃদয় চেতনা মথিত করে সে সব প্রতিবাদ। উদ্বেলিত আন্দোলনকে আহ্বাণ করলেন যে দীপ্তকণ্ঠে যেন আবহমানকে দাঁড়করিয়ে দিলেন যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের জনসমুদ্রে। যে দ্বিধাগ্রস্থ দুর্বলতাটুকু আমাদের অনেক সময় প্রতিবাদে প্রতিরোধে সামিল হতে সংশয়ী করে, অনেক অন্যায় অবিচার অত্যাচার, প্রতিবাদ প্রতিকার হীন হয়ে চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া সে প্রতিবাদীসত্তার পুরুষাকারকে প্রবাদ কবিতায় সমকালীন করে দিলেন বিষ্ণু দে—

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয় আমার চড়া
চোরাবালি আমি দুরদিগন্তে ডাকি
কোথায় ঘোড়সওয়ার?...
হে প্রিয় আমার প্রিয়তম মোর,
আয়োজনে কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার? (ঘোড়সওয়ার)

এই 'পুরুষকার' শুভচিন্তক শুভমানসের প্রতিবাদী সত্ত্বাটুকু যে বড় দরকার এই সময়, যদি অঙ্গীকার রাখে ঘোর মানবতার দুর্দিনে, পরিত্রাণের অঙ্গীকার।

এই পরিত্রাণের প্রামান্য অসংখ্য মানুষের মিছিল যখন পথ হাটে, জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কী মনে হয় না অন্যায় স্বৈরাচার অত্যাচার মুক্তির সেই 'ঘোরসওয়ারে'র পদধ্বনি যেন শুনতে পাই। শুনতে পাই পায়ে পায়ে যে জনসমুদ্র আজকের আরব বসন্তে, তাহরির স্কোয়ার, তাকসিম স্কোয়ারে, অকুপাই ওয়ালা স্ট্রীট আন্দোলনে, নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের মিছিলে, নির্ভয়া কামদুনি অপরাচিতার প্রতিবাদে, শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে, সমসময়ের এক এক আন্দোলন এবং অঙ্গীকারের দায়বদ্ধতা থেকে উঠে আসে। এই সাইবার শাসিত বিশ্বে যে ঘোড়সওয়ার হয়ত কখনও কখনও হয়ে ওঠে ভার্চুয়াল কখনও প্রখর বিয়াল। বাস্তবের স্বপ্নভূমি।

প্রতিবাদের কণ্ঠ কখনও বলিষ্ঠ কখনও তির্যক কখনও মিষ্টিক। যখন নৈরাশ্য নৈরাজ্যের প্রতিবাদের ভিতর এক আশাবাদও কাজ করে, প্রতিবাদ প্রতিরোধে নৈরাশ্যের দিন কেটে যাবে, এ যেমন বৈজ্ঞানিক দর্শন, তেমনি আধ্যাত্মিক চেতনা যা শুভবোধকে প্রদীপ্ত করে সেই ভাব গ্রাহীতায় উত্তরাধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী লেখেন, 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'

মেলাবেন তিনি ঝেড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
এ ভাঙ্গা দরজাটা মেলাবেন... (সংগতি)

ধ্বসে পড়া মূল্যবোধ নিরাশা থেকে উত্তরণ, প্রখর বাস্তবের সঙ্গে চলতে চলতে যখন সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত তখন এই ঐশী প্রবাদ পংক্তি—বিজ্ঞান নির্ভর সাইবারশাসিত আধুনিকেও এক শুশ্রূষা, এক নিরাময় এক বিশ্বাস, আর এই বিশ্বাসটুকু বুকে নিয়েই তো বাঁচা।

প্রতিবাদ সব সময় সোচ্চার হয়না অথচ অগ্নিময় সময়কে অতিক্রম করতে গেলে আক্রান্ত হতেই হয়, হতে হয় ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত—

'আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে?
আমার দিন আর রাতগুলোয় বাঘ নখ বসা।'

এই স্বস্তি-হীনতার উচ্চারণ অরুণ মিত্রের। ফরাসী ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত তিনি। অলংকার বর্জিত গদ্যে লেখা তাঁর কবিতা, উচ্চকিত নয়, কিন্তু অনিবার্য আগুনে পুড়ছে তাঁর রাত্রিদিন, যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন তিনি মানব সভ্যতার বিপর্যয়ে। তিরিশ চল্লিশের মধ্যবর্তী সময়ের কবি তিনি, ঘৃণ্য ফ্যাসীবাদ নাৎসীদের নারকীয় অত্যাচারের প্রতিরোধ প্রতিবাদে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকায়—

প্রাচীর পত্রে পড়োনি ইস্তাহার?
লাল অক্ষর আগুনের হলকায়...ঝলসাবে কাল জানো (ইস্তাহার)

তিরিশ থেকে চল্লিশ দশকের সময়কাল প্রতিবাদ বিশ্বে এক ঘোর সংকটকাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা ক্ষুধার্ত মানুষের মৃত্যু, দিশাহীন সমাজ, ঘৃণ্য ফ্যাসিবাদ, ভারতবর্ষে বামপন্থী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদ, তেভাগা—তেলেঙ্গানা আন্দোলন, সব মিলেমিশে কবিতার অভিমুখ হয়ে উঠল দায়বদ্ধতার স্বাক্ষরে রক্তিম। আত্মমগ্ন কবি, রোমান্টিক চেতনার কবি নির্জনের কবি সমকালের তীব্র সংকটে সচেতন হতে শুরু করলেন। চাঁদ নিয়ে কাব্যের অলংকৃত পেলব উপমাতে শাণ দিলেন বাম মতাদর্শী কবি দিনেশ দাস, 'কাস্তেটা শান দিও বন্ধু'-র মতো কবিতা লিখলেন—

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে— (কাস্তে)

বামপন্থী আন্দোলনে প্রায় মন্ত্রের মতো ব্যবহৃত এই প্রবাদ পংক্তিতে তিনি চাঁদ কে করে দিলেন বিপ্লবের হাতিয়ার—কাস্তে হাতুরী তারার' প্রতীকে।

স্বল্পায়ু কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাত্র আঠোরো বছরের দুঃসহ স্পর্ধা নিয়ে চাঁদের উপমায় এগিয়ে গেলেন আরও একধাপ—ক্ষুধার্তের চাঁদ বিলাসকে নিজের তরবারি তীক্ষ্ণ শ্লেষে তিনি গণমানসের দৃষ্টি বদলে দিলেন তীব্র আঘাত —

'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।
পুর্ণিমাচাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'।

শুধু চাঁদই এই প্রবাদ পংক্তিবৎ কবিতা-তথা 'পদ্য'-র নন্দনতত্ত্বেও হানলো তীব্র আঘাত সমসময়কে কেন্দ্র করে। কারণ সে সমকাল দেখছে দেশভাগ আগ্রাসন যুদ্ধ, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, ক্ষুধা—শুনেছে 'ফ্যান দাও' আর্তরব, দেখেছে অনাহার মৃত্যু, সন্তানের পাশে মা-এর বুক কামড়ে সন্তান, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস। প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে উঠে আসা এই প্রবাদ পংক্তি দেশ কাল সময়ের প্রতিটি নিরন্নের, প্রতিটি ক্ষুধামুখের এক অমোঘ সত্য হয়ে উঠেছিল।

সংবাদে পড়ি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশ 'দেশে যেন অনাহারে একটি মৃত্যুও না ঘটে অথচ দেশ জুড়ে ভুখা নিরন্ন অনাহারী মানুষের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণহীন। অনাহার আর ক্ষুধা নিয়ে তৃতীয় বিশ্বে যে সব মানুষ আজ অর্ধমৃত, সোমালিয়া বা কালাহাণ্ডি, আমলা শোল বা বিদর্ভ, তরাই ডুয়ার্সের এক এক প্রান্তে। তাদের এক এক মুখ কৃষক, শ্রমিক, মজুর, চা—শ্রমিক, তুলোচাষী, আলুচাষীর, মৃত্যুমিছিলের মুখ। অথবা আত্মহননে তাদের চন্দ্রবিলাস —পোড়ারুটি বা ঝলসানো চাঁদের উপমায় অভ্রান্ত সত্য।

স্বাধীনতা উত্তর এই দেশ—শরণার্থী উদ্বাস্তু কলোনি নৈরাশ্য অবক্ষয়ী মূল্যবোধ নিয়ে নগর জীবনের আদ্যন্ত নাগরিক কবি সমর সেন এক দুঃসাহসী প্রতিবাদ উসকে

দিয়েছিলেন নারী চেতনার মর্মমুলে। প্রেম বিবাহ এবং সন্তান ধারনের আর্বতে যে সমসময়ের নারী—

'হে ম্লান মেয়ে প্রেমে কী আনন্দ পাও?
কী আনন্দ পাও সন্তান ধারনে?'

আপাত নিরীহ এই শব্দবন্ধের মধ্যেই থেকে যায় বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গটুকু। আবহমানের সমাজ সংসারে এক নারীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তির ইশারা। সাম্যবাদী ভাবনায় সংক্রামিত হয়েছিলেন তিনিও—

যারা লাঙলে তিলে তিলে সোনা ফলায়
অন্নের প্রাণের কাঙাল
নয়নাভিরাম নীল মেঘ দেখে যারা ফসলের দিন গোনে
কারখানার কলে যারা দধীচরি হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে
শহরে শহরে। (খোলা চিঠি)

তাদের কথাই প্রতিবাদী পরম্পরায় বলে গেছেন চল্লিশের কবিরা। শহর গ্রামের অতলান্ত ফারাকে যে সচ্ছলতায় শস্যের মজুত ভাণ্ডারে খাদ্যের অপচয়ে, বিলাসের নগরজীবন আর নিরন্ন অনাহারী চাষীর ঘর, শ্রমিকের পরিবার স্বভাবে তেভাগা তেলেঙ্গানা থেকে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম। লকআউট, বন্ধ হয়ে যাওয়া অগুন্তি কলকারখানার হতভাগ্য শ্রমিকদের হরতাল ঋণগ্রস্থ চাষীদের ক্ষোভ আত্মহননে। সেসব কথাই উঠে এল সমসময়ের দাবীতে মনীন্দ্র রায়ের কবিতায়—

চাষীর খামারে ওঠে তেভাগার উপদ্রুত সারা
সেদিন সুলালগন্ধে হিংস্র ক্ষুধা খাণ্ডবের রোষে জ্বলে গেল কত ঘর

একটি আন্দোলন একটি বিপ্লব একটি শতাব্দী চিহ্নিত মিছিল যে ভাবে উজ্জীবিত করে একজন কবিকে তেমনি এক একটি কবিতার প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণও জনগণ মানসের প্রেরণা শক্তি উজ্জীবনে সমসময়ে সময়ান্তরে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যেভাবে পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনবদ্য হয়ে রয়েছেন অসংখ্য প্রবাদ পংক্তিতে—

'আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন
মিছিলের একটি মুখ'

এই আন্দোলিত মিছিল থেকেই শোষণ বঞ্চনার অবসানে দিনবদলের স্বপ্ন দেখান তিনি,

'অদ্ভুত আঁধারের অন্ধকার থেকে মুক্তি সূর্যের লাল টুকটুকে দিন

তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি লাল টুক টুকে দিন।' (লাল টুকটুকে দিন)

দিন বদলের এই স্বপ্নেই তো বাচিয়ে রাখে দীর্ঘমেয়াদী বিপ্লবকে। যে বিপ্লবে শত শত তাজা প্রাণের বিনিময়ে বিপ্লবের ভিতর নষ্ট সময়ের ঘুন পোকা ব্যর্থ করে দেয় দিন বদলের বুনিয়াদ। স্বপ্ন ভঙ্গের আশঙ্কায় আগুনঝরা দিনের চেতাবনি হয়ে উঠল যে পংক্তি—

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য।
কাঠফাটা রোদে সেঁকে চামড়া (মে দিনের কবিতা)

মিছিলে গণআন্দোলনে এধ্বনির গতি, শব্দের যতি, ছন্দে উদ্যম প্রেরণার আবেগে মুখর থেকেছে মানুষ। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছিল সমকালের 'ভারতছাড়ো আন্দোলন', স্বদেশী বিপ্লব, অগণন শ্রমিক মজুর কৃষকের গণআন্দোলন, দাঙ্গা, সীমাহীন দারিদ্রতা, ক্ষুধা বঞ্চনা। সাম্যবাদী মদাদর্শের প্রত্যক্ষ লড়াকু তিনি জেলে কাটিয়েছেন দু'বছর। অথচ এই পদাতিক সৈনিক কবিকেই মতাদর্শের অনৈক্যে, বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গে যাপন করতে হয় নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাদগ্ধ দিন, নিন্দা মন্দ তিরস্কারের উর্ধ্বে তিনিই প্রতিবাদকে মাত্রা দিলেন বহুরৈখিক পংক্তিমালায়—

ফুল জমে জমে পাথর হয়
মালা জমে জমে পাহাড় ফুলগুলি সরিয়ে নাও
আমার লাগছে
আহত বিশ্বাসের মৃত্যুতে গোলাপ যে পাথরের থেকেও ভারী হয়ে ওঠে।

মানুষেরই কথা বলেছেন তিনি প্রতিবাদী সত্তায় কবিতায় মননে জীবন যাপনে—

'তুমি মানুষের হাত ধরো
সে কিছু বলতে চায়'

মানুষের বলতে চাওয়া কথা শুনেছেন তিনি মর্ম দিয়ে, চৈতন্য দিয়ে, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন অবিচল, স্থির দৃঢ় প্রত্যয়ী আদ্যন্ত মানবতার কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রতিবাদ প্রতিরোধে, বিপ্লবের ভুল প্রয়োগে, যখন বিনাশী হয়ে ওঠে সময়, অকারণ রক্তপাত হত্যা মৃত্যু তখনই সরাসরি তার প্রতিবাদী সত্তা থেকে উঠে আসে রক্তাক্ত প্রবাদ পংক্তি। নকশাল দমনের নৃশংস হত্যাযজ্ঞে বলি অগণন যুবককে নিয়ে তিনি লেখেন—

'মুণ্ডহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে রঙ্গিলা! রঙ্গিলা!

কী খেলা খেলিস তুই!
যন্ত্রনায় বসুমতী ধনুকের মতো বেকে যায় (মুণ্ডুহীন ধরগুলি)

হত্যা—তো মানুষই মানুষকে করে, লোভে লালসায় হিংসায়, অকারণ সন্ত্রাসের ভীতি প্রদর্শনে। এই যে বিশ্বজুড়ে পণবন্দীর শিরচ্ছেদ ছবি ভিডিও বন্দী হয়ে প্রচারিত হয়ে চলেছে মিডিয়ায় সংবাদ পত্রের পাতায় শিউড়ে ওঠা জনমানসের রক্তের অর্ন্তগত উচ্চারণে কী এই 'মুণ্ডহীন ধর'—সমসময়ের প্রত্যাঘাত সৃষ্টি করে না?

তাঁর প্রতিবাদী স্বত্তা তখনই রক্তাক্ত হয়েছে, যখন অন্যায় শোষণ, রাজনৈতিক অরাজকতা, ভ্রষ্টাচার, ধান্ধাবাজ সময়ের নিস্পেষণ, অত্যাচার, নেতৃত্বের স্বৈরাচারে দেশ সমাজ মানুষ মৃতকল্প হয়েছে।

মুখে যদি রক্ত ওঠে
সে-কথা এখন বলা পাপ
নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা পাপ।'
(মুখে যদি রক্ত ওঠে)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সে ভয়াবহ দিন—ত্রাসের দুর্ভিক্ষের নিরন্নের মড়কের, উপবাসীর 'ভাত নয় ফ্যান দাও' আর্তি, মৃত সন্তানের পাশে মায়ের জঠরের আগুন ভুলিয়ে দিচ্ছে সন্তানের শোক ক্ষুধার কাব্য যে কত অনুভুতিময় তীব্র হতে পারে।

'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
...আর আমরা সারারাত জেগে থাকি আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,
প্রার্থনায়, সারারাত।' (আশ্চর্য ভাতের গন্ধ)

শুধুমাত্র সংবাদে পড়ি, ছবি দেখি ক্ষুধকাতর সন্তানকে অভাবের জ্বালায় বিক্রী করে দিচ্ছে মা অথবা বিষমাখা সন্দেশ মুখে তুলে দিয়ে সন্তান সহ আত্মহননে নিরন্ন মা। আমরা যারা দু'বেলা অন্ন প্রসাদে জীওল, আমাদের পাশেই ভাতের গন্ধে রাতজাগা তাহাদের কথাই তো এই প্রবাদ কবিতায়।

চল্লিশের উল্লেখযোগ্য কবিরা লিখেছেন এমনই সব স্মৃতিধার্য প্রতিবাদী প্রবাদ প্রতিম পংক্তি যা আজও যে কোন প্রাসঙ্গিক ঘটনার শিরোনামে, মুখের কথায় বহমানতায় ভাস্বর। সমসময়ের এই প্রজন্ম জানেই না মধ্যরাতে পাওয়া দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার যন্ত্রণা। যে স্বাধীনতা ক্রমেই উপভোগ্য হয়ে উঠছে উচ্ছৃঙ্খলতায়, অরাজকতায় অবমূল্যায়ণে। এই স্বাধীনতাকে খণ্ড বিখণ্ড করে চলেছে সমসময়, যে স্বাধীনতা কিনতে হয়েছে কত যে কিশোর যুবকের ফাঁসির রজ্জু প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে, কত শহীদ জননীর যন্ত্রণার বিনিময়ে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সে ইতিহাস চিরসত্য মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কলমে—

ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা (জননী যন্ত্রণা)

প্রাসঙ্গিকতায় মনে হয় সেই সব জননীদের কথা, যাঁদের সন্তানেরা শহীদ হওয়ার সম্মান টুকু পেলনা অথচ মুক্তির বিপ্লবে প্রাণ গেল রাস্তায় হাটে মাঠে থ্যাঁতলানো ইঁদুরের মতো, বুক ফুড়ে এফোড় ওফোড় হয়ে। অথবা সেইসব জিহাদীরা জন্নতের শপথে যারা আত্মঘাতী মানববোমায় ছিন্নভিন্ন লাশের টুকরো। সে সব সন্তানহারা মায়েদের যন্ত্রণা কী একই যুগ যন্ত্রণার শরিক হয়ে যায় না!

এক একটি আন্দোলন যেমন চিহ্নিত হয়ে যায় রাজনৈতিক পটভূমিতে, কালের ইতিহাসে, সেভাবে এক এক কবির স্মরণযোগ্য পংক্তি সে আন্দোলনের মানবিক পটভূমিকে তুলে ধরে কবিতার ইতিহাসে—

আন্তর্জাতিক ভাবে চল্লিশ এক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবের দশক, ইউরোপ রাশিয়া চীনের বদলে যাওয়া সময় ও পরিস্থিতিতে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলা কবিতায় যে বামপন্থী ধারা বইতে শুরু করল, তাতে বামপন্থী আন্দোলনের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। কাকদ্বীপ থেকে উঠে আসা তেভাগা কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামকে কিংবদন্তী পংক্তিতে ইতিহাস করে দিয়েছিলেন রাম বসু—

'শোন,—বাঁকের মুখে পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে;
শোন বাইরে এস.....শাসনের মুগুর মেরে
আর কতকাল চুপ করিয়ে রাখবে
বাইরে এস
আমরা হেরে যাব না
আমরা মরে যাব না
আমরা ভেসে যাব না'

নিটোল এক ছবিতে রয়েছে সেই সব দরিদ্র বঞ্চিত শোষিত কৃষকের গৃহাস্থলী সন্তান ঘরকন্নার করুণ দারিদ্রের ছবি। গ্রাম শহরের, ধনী গরিবের, মালিক মজুরের যে ফারাকটা আমার ঢেকে রাখি সমস্ত মিথ্যাচারে, কপটীতায় সে ছবি-র প্রেক্ষাপট থেকে এই একবিংশ শতকের প্রেক্ষপটের ছবিতে বঞ্চনার ফারাক নেই। তেভাগা থেকে নন্দীগ্রাম, সংগ্রামের স্থান কাল পাত্র বদলে যায় মাত্র। আগ্রাসনের ভূমিকা বদলায় না—পরান মাঝি বদলে যায় হারাণ মণ্ডলের ভূমিকায়, প্রবাদ পংক্তি হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

প্রতিবাদের ভিন্নমুখী স্তরভেদ রাজনৈতিক পটভূমি ক্ষোভ বঞ্চনা ক্ষুধার বাইরেও প্রতিবাদের নানা স্তর উঠে এল বাংলা কবিতায় চল্লিশ পঞ্চাশের দশক ধরে। কবিদের দেখার চোখটিতে তুচ্ছ থেকে মহৎ-এ এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে ফাঁকি তীব্র শ্লেষে বিদ্রূপে কৌতুকে তির্যকে উপমায় অথবা সরাসরি লেখা হতে থাকে সে সব অব্যর্থ প্রতিস্পর্ধী বাক্যবন্ধ। যেভাবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখনীতে—

সবাই দেখছে যে রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে শাবাশ, শাবাশ! (উলঙ্গরাজা)

নির্লজ্জ চাটুকারী এই সব চরিত্র, স্তাবক ধন্য চরিত্র যা সমাজে এক ক্ষতের মতো। মুখোশের আড়ালে ক্ষতি করে যায় রাষ্ট্রের, সমাজের মানুষের। 'শিল্পের জন্য শিল্প' 'কবিতার জন্য কবিতার' বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই কবি, উলঙ্গ করে দেয় কপটতা ভনিতা স্বৈরাচারের আড়ালে দেশনায়ক সমাজ সংস্কারকদের ভণ্ডামিকে। সমকালীন কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নয়, চিরকালীন প্রতিবাদে তির্যক এ পংক্তি উচ্চারিত হয় সময়কে বিদ্ধ করতে।

বামপন্থী আন্দোলনে অটল প্রত্যয়ী হয়েও কবিতায় তিনি বহুমুখী স্থির বিশ্বাস থেকে মানবিকতার সন্ধানে হয়ে উঠেছিলেন প্রতিবাদী। সত্তরের অগ্নিগর্ভ দিনগুলি যেভাবে সমকালীন হয়ে ওঠে অমিতাভ দাশগুপ্তর প্রতিবাদী চিত্রকল্পে—

তুমি তাকে ধরে বেঁধে সহিষ্ণুতা পারো না শেখাতে,
দু-আঁখি পাগল করা মাঝরাতে
তোমার ছেলের হাতে বিষের নাড়ুর মত বোমা—
(ক্ষমা? কাকে ক্ষমা?)

যুদ্ধ শিবিরে। বিপ্লবের ঘরে, জঙ্গীসংগঠনে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণে যে সব কিশোর যুবক বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে আত্মাহুতি দিয়ে চলেছে সেই সব ছেলেদের তৈরী করল যে রাষ্ট্র দেশ বিপ্লব নেতৃত্ব অথবা মানুষ-এ প্রবাদ পংক্তি সমকালীন হয়ে ওঠে তারই উৎস সন্ধানে।

এই মানুষই তো নিহত হয় মানুষের হাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসস্তূপে বা গুজরাট দাঙ্গায়, ভূপালের মারণ গ্যাসে। ৯/১১ ধ্বংসচিত্রে, মানব বোমার বিস্ফোরণে, টুকরো হয়ে যাওয়া গলিত খণ্ডিত মানুষ। ভুস্বর্গ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা, উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিমে রাজ্যের এক এক মানুষ—এই মানুষই হিরোশিমার পরমাণু তাপে বা নাৎসী ক্যাম্পের হলোকস্টএ যন্ত্রণা দগ্ধ মানুষ—ঘাতক সময়ের হাতে নিহত মানুষ। পণবন্দী শিশু, বেসন্ধান। চেচেনিয়া, পেশোয়ারে সারি সারি কফিন বন্দী শিশু শব। অথবা আবুঘ্রাইবের গরাদে শিকলবন্দী, চাবুক প্রহারে বেঁকেচুরে যাওয়া ক্ষতবিক্ষত মানুষ। এদের জন্য রুদালীর কান্নাও আর অবশিষ্ট নেই। এদের কথাই সমকালীন পংক্তি তে এসে মিশে যায় সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায়—

তোমার দেশ নেই রাষ্ট্র নেই তোমার
শুধু মানুষ

তোমার জন্য লেলিহান শহর
আর ধ্বংস স্তূপের বেহস্ত্
আর নিহত শিশুদের
হাসপাতাল...' (তোমার দেশ নেই রাষ্ট্র নেই)

চল্লিশের নানা আন্দোলন, দেশভাগ ফ্যাসীবাদ চেতনার গভীরে যে ছাপ রেখে যায় তার থেকে উঠে আসে প্রতিবাদ, সমসময়ের প্রেক্ষিতে। কবিতার অক্লান্ত যোদ্ধা কৃষ্ণ ধর সমসাময়িক হয়ে ওঠেন সত্তরের নির্মম হত্যার দিনগুলির সাক্ষী হয়ে—

সে যন্ত্রণায় নীল হয়ে একবার ডেকেছিল মাকে
তবু স্বপ্নকে অক্ষত রেখেই সে
বধ্য ভূমিতে গিয়েছিল একদিন সত্তর দশকে। (একদিন সত্তর দশকে)

প্রবাদ প্রতিম এইসব পংক্তিরা প্রতিবাদের এক শিলমোহর হয়ে সমসময়ের বুকে ছাপ রাখে—যা পুনারাবৃত্ত উদ্ধৃতি হতে থাকে ঘটনা পরম্পরার ঐতিহ্যে।

পাঁচের দশকের শেষ থেকে ষাটের দশক আন্দোলনের দশক ছাত্র আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, ভূমি আন্দোলন এবং সাহিত্য আন্দোলনের এক বড় ভূমিকা এই দশকে যে ভূমিকা থেকে প্রতিবাদ এবং বাঁক বদলের ঘরানা চিহ্নিত হয়। রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার এই বাঁক বদল অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠে। এই সময় কবিতায় হাংরি আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন ধ্বংসকালীন কবিতার আন্দোলনে, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, প্রতিবাদী কবিতায় এক ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হল।

ষাটের কবিরা এই সব আন্দোলনের মধ্যে, এক তুমুল অস্থিরতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করছেন উত্তাল নকশাল আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি—হত্যার বদলা হত্যা, শাসক এবং শোষণের অভিন্ন পন্থাকে ঘৃণ্য চক্রান্তকে, রাজনৈতিক ক্ষমতার নিলর্জ্জ প্রয়োগকে উদ্দেশ্য করে উৎকণ্ঠিত প্রতিবাদে, শ্লেষে, বিদ্রূপ ঝলসে উঠলেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য—

'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'।

অগ্নিশলাকার মতো এ উক্তি মেনেই তিনি লিখলেন সে সময়ের নরক রাত্রির এক আগ্নেয় কবিতা, মাত্র দু'পংক্তিতেই যার চরম চিত্রলিপি—

উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই
সেই ডানপিটের তেজীরক্ত ধারা
গোধুলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা। (গান্ধী নগরে এক রাত্রি)

জনমানসের চোখের সামনে ঘটে চলা এই সব নারকীয় হত্যাদৃশ্যকে তিনি অনন্তের কবিতায় গ্রন্থিত করলেন, আর মনুষ্যত্বের চরম অবমাননায়, মৃত্যুতে যখন রাজনৈতিক

সমীকরণ, দলতন্ত্রের নগ্ন চেহারা প্রকাশিত হয়ে যায়, কমলেশ সেন প্রতিবাদকে সমসময়ের দলিল করে তুললেন—

মানুষ খুন হয়ে গেলে লাশ হয়ে যায়,
শব্দতত্ত্বে লাশের কোন পিতৃপরিচয় নেই
মৃত্যুর পর লাশ পতাকার রূপ ও বর্ণ হয়ে যায়
(মাফ করবেন খোদা)

ইতিহাসের সত্য সমকালীন থেকে চিরকালীন হয়ে ওঠে কালের দাবীতে আর মহৎ সৃষ্টির দাবীতে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবাদ প্রতিম হয়ে ওঠে এক আলেখ্য, উক্তি বা পংক্তি স্বরূপ কবিতা।

'যে কোন শিল্পই হবে রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ'

উচ্চকিত প্রতিবাদ বা স্লোগান নয়, উচ্চারিত এই বিশ্বাসই স্থির সত্য হয়ে চিরধ্রুব হয়ে আছে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সার্বিক সাহিত্যে, কবিতায়, সম্পাদিত কবিপত্রে। ষাট দশকের ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলনের পথিকৃৎ তিনি মিথ্ ঐতিহ্য পরম্পরা শিকড়ের উৎসসন্ধানী যখন ঢুকে পড়েন রাজনীতি, দুর্নীতি, অস্থির সমাজনীতির আবর্তে ক্ষতবিক্ষত প্রতিবাদে আহত তাঁর কবিতা পংক্তি—

যুদ্ধ করছি চক্রব্যূহে, বেরুবার পথ জানি না
মা তুমি আমাকে জাগালে না কেনো? (অভিমন্যু)

আবার সমসময়ের কবিতায় প্রতিবাদ এক প্রবাদ বাক্যের চেতাবনি—

'দৈত্যকে বোতল থেকে মুক্তি দিলে তুমিও বাঁচবে না,
তোমার আগ্নেয় মৃত্যু উপহার, তোমার অদম্য ছাত্রীসেনা
তিলে তিলে মরণের জীবাণু ছড়িয়ে,
শস্য ক্ষেতে লোকালয়ে জলে ও বাতাসে কোন
স্বর্গে পৌঁছে দেবে
তোমাকে?' (ধর্মান্ধের উদ্দেশ্যে)

পঞ্চাশ থেকে ষাট দশকভিত্তিতে সাহিত্যের অঙ্গনে কবিদের গোষ্ঠিবদ্ধ লেখনীর বাঁক বদল চিহ্নিত হল। কৃত্তিবাস, শতভিষা, কবিপত্র, উত্তরসুরী হাংরি শ্রুতি পত্রিকানুসারী লেখক চিহ্নিত হলেন, চিহ্নিত হল লেখা স্বর। অথচ থেমে রইলনা রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিভিন্ন দাবীতে আন্দোলন এবং সমসময়ের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, তার অভিঘাত। অভিজ্ঞতার কাল হিসাবে রইল চল্লিশ পঞ্চাশ দশকের স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু

সমস্যা দুর্ভিক্ষ ক্ষুধা হাহাকার। কবিতার ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যার প্রভাব রইলই।

'এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়', —এই উচ্চারণের কবিকে দশক ভিত্তিতে চিহ্নিত করা যায় না। প্রতিবাদ শঙ্খ ঘোষের সত্তার আমূল গভীরে প্রোথিত এক নিবিড় সত্যে। যে প্রতিবাদ শুধুমাত্র লেখনীতে নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণে সে প্রতিবাদকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে তাঁর কবিতা।

'নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে...'

বহুচর্চিত এই ক্ষুধাকাব্যের রচনাকাল পঞ্চাশ দশক। সে সময় থেকে এই শূন্য অতিক্রান্ত দশকেও অনাহার এই দেশের এক অভিশাপ। মাঝে মধ্যেই সংবাদ শিরোনামে দেখি অনাহারে সন্তানের মৃত্যু, অভাবী মায়ের অথবা সন্তানসহ বিষপানে আত্মহনন। প্রবাদ প্রতিম 'যমুনাবতী' এক সময় অতিক্রান্ত প্রতিবাদ যা সমসময়ে আক্রান্ত এক পরিণাম। যখন দেশ সমাজ রাষ্ট্র মানুষ বিপন্ন হয়েছে মানুষের তৈরি সন্ত্রাসে হিংসায় ধ্বংসে, তখনই বহুমাত্রিক স্তরে তাঁর প্রতিবাদ প্রবাদ প্রতিম হয়ে উঠেছে। বাবরি ধ্বংসে গুজরাট দাঙ্গায় যদি লেখেন—

'হিমাচল শিলা থেকে সাগর অবধি আমি ছুঁড়ে দিই ত্রাস
আমার কি এসে যায় বাঁচে কি বাঁচে না ইতিহাস'

নন্দীগ্রামের রক্তাক্ত দিনগুলিতে আলোড়িত তিনি, সজাগ এবং সক্রিয় প্রত্যক্ষ প্রতিবাদে। আগ্রাসন এবং আক্রমণকে রূপায়িত করেন তাঁর তীব্র শ্লেষে—

'আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে' (স-বিনয় নিবেদন)

আর সত্তরের সেই অগ্নিগর্ভ সময় রক্তে ভিজে ওঠা মাটি, তরতাজা যুবকদের রক্তে যে হত্যা প্রতিশোধে যে এক নির্মম খেলা, ক্ষোভ অথবা দমচাপা জরুরী অবস্থার পরিস্থিতে ক্ষমতার আস্ফালনে তাঁর তীব্র ক্ষোভ—

'পেটের কাছে উচিয়ে আছো ছুরি
কাজেই এখন স্বাধীন মতো ঘুরি
এখন সবই শান্ত, সবই ভালো ' (আপাতত শান্তি কল্যাণ)

তাঁর সজাগ দৃষ্টি এবং সচেতন মানসিকতা থেকে এড়িয়ে যায়নি রাজনৈতিক সামাজিক অথবা ধর্মান্ধ হিংসা অপশাসনের দুঃসময়—

'এত ছোট খাটো কাণ্ডে কেঁদে কেটে মাথা হবে হেঁট?
চরিত্রই নেই যার তার আবার ধর্ষণ কোথায়?'

সংবাদ কীভাবে কবিতায় প্রাসঙ্গিক প্রবাদ হয়ে ওঠে প্রামাণ্য এই সব পংক্তিতে ইতিহাস এবং সমকাল তার সাক্ষী দেয়।

এই যে সময়কাল ধরে বিশ্বময় ইরাক-ইরাণ ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন-গাজা ভুখণ্ড, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে মানচিত্রময় হিংসা হত্যা মৃত্যু বিস্ফোরণ রক্ত গৃহযুদ্ধ আশ্রয়হীন দিশাহীন নারীশিশু মানুষের অশ্রুজল, ক্ষতবিক্ষত দেহের ছবি, সংবাদ। আহত মৃত মানুষ কোন নাম নেই অধয়ব নেই—শুধু সংখ্যায় চিহ্নিত, কেন এই হত্যা? কেন? প্রবাদ পংক্তি কি বলে দেয় সে কথা—

'মারব না কি নির্ভূমিকে? নিরন্নকে? নিরস্ত্রকে?
অবশ্য কেউ মেরেছিল সেটাই বা কে প্রমাণ করে।' (অন্ধবিলাপ)

মিথ্‌কল্পে লেখা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবর্ণনার ছবি—অথচ কত যে সমকালীন হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশ থেকে ষাট প্রতিবাদের রূপরেখার যে বহু রৈখিকতা তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নয়, প্রতিবাদ অস্তিত্বের বিপন্নতায়, প্রতিবাদ আত্মসংকটে। প্রতিবাদ নিয়মভাঙার প্রথা বিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচারে, বোহেমিয়ান জীবন দর্শনে। একটি দশককে শক্তি চট্টোপাধ্যায় একাই চিহ্নিত করে রাখলেন তার ছন্দ ধ্বনি শব্দ ও চিত্রকল্পে—

'তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি?
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী।' (আমি স্বেচ্ছাচারী)

স্বেচ্ছাচারের যে প্রতিবাদ রক্তের গভীরে, যে যুক্তি মানে নিয়ম মানে না, বোহেমিয়ান যাপনচরিতে যে আঁশটে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের সমাজ সংসার কিছুই মানে না। প্রয়োজনে প্রতিবাদে আত্মহুতি দিয়ে স্বেচ্ছাচারকে চিহ্নিত করে সময়ের বুকে এক আত্মবিদ্রোহে। আর বিপ্লবের বিশ্বাসের ভিতর যখন ঘুণপোকা, যখন বিপ্লবের কাঠামোটুকুই থাকে, আত্মামৃত, আগ্রাসনে ক্ষমতার আস্ফালনে যখন

'কঙ্কালের ভিতর সাদাঘুণ, ঘুণের ভিতর জীবন,
জীবনের ভিতর মৃত্যু'

যে মৃত্যু প্রতিবাদ হীন, প্রশ্নহীন, দায়হীন—শুধুদৃষ্টি মেলে দেখে যাওয়া—

'বিষণ্ণ রক্তের দাগ রেখে গেছে অন্ধকারে ফেলে
মুণ্ডুহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ।.....
কেন এই নিদারুণ হত্যা?
কেন মায়াহীন ক্রোধ এই বাল্যকালে ওই আমার সন্তান কী করেছে?
কোন অপরাধে এক প্রাণবন্ত জীবন আধারে?
ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, ও শুধু বিপ্লব চেয়ে দোষী'। (রক্তের দাগ)

বিপ্লবের বীজ, জিহাদের শপথ, সন্ত্রাসের, বিস্ফোরক ধর্মান্ধতার অন্ধকার কারা বপন করে আমার তোমার তাহার সন্তানের মগজে, কোষে কোষে। প্রবাদ প্রতিম তীক্ষ্ণ এ প্রতিবাদ প্রশ্নই নাড়িয়ে দেয় আমাদের আমূল বিশ্বাসের সত্তা, বিপ্লবের অসারতা বা সন্ত্রাসের কারসাজিতে বলি হয়ে যাওয়া অগণন সন্তানের মৃতদেহ আগলে বসে থাকা শোকার্ত হতবাক প্রজাতি বা বিমূঢ় দেশকে। অতএব যখনই সংকট বা দুঃসময়, প্রবাদ মন্ত্রের মতো সময়সর্তক শিরোনাম কবিতা সেই কালাতীত হয়ে সমসময়ের বুকে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে—

'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়'

প্রতিবাদ কখনও আক্রমণাত্মক কখনও বিদ্রূপাত্মক কখনও সচেতক বিবেকের ভূমিকায় সর্তক করে দেয় সমসময়ের দুর্বিপাক দুর্ঘটনাকে আবার কখনও ভাবনার জগতে ওলট-পালট ঘটিয়ে দেয়া কোন আত্মধ্বংসী প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদী যদি হয়ে ওঠে বেখাপ্পা রকমের বোহেমিয়ান—সে প্রতিবাদের থই পাওয়া দুরহ। যেভাবে তুষার রায়ের প্রতিবাদ এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় পাপ পূণ্যের বিচারে—

'বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে
শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়া নিভেগেলে
ছাই ঘেটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা।'

ছাই ঘেটে অমূল্যরতন পাওয়ার মতো তুষার রায় প্রতিবাদ-কে মিথ্ করে দিলেন। আত্মধ্বংসী মৃত্যুচেতনার মধ্য দিয়ে পাপের সংজ্ঞা নিয়ে যে তুমল ঠাট্টা তাতে প্রতিবাদের সংজ্ঞাও পাল্টে যায়। একমুষ্ঠি সরিষা খোঁজার মতো চিতার ছাই ঘেটে পাপ খুঁজবে কোন পূণ্যবান? কারণ প্রতিক্রীয়াশীল পুণ্যাত্মারা জানেন—

'একমাত্র কবিই তেমন ঘৃণা করতে পারেন
ভালোবাসতে পারেন হয়ে, বুকের ভিতরে বুক

একমাত্র কবিই তো করতে পারেন প্রতিবাদ
ঠ্যাঙারে প্রতিক্রিয়াময় রাজনীতির সামনে
দু'হাজার সাবমেরিন গান তখন চুপ হয়ে যায়....।'

ষাট দশকেরই ভিন্ন চেতনার প্রতিবাদ কবিতা নিয়ে হাংরি আন্দোলনের সময়কাল। ঐতিহ্য পরম্পরা শিকড় এবং ধ্রুপদী চেতনাকে অস্বীকার করে শোভন সুন্দর শিল্পিত যা কিছু তার বিরুদ্ধে অসুন্দর কর্কশ সাদা বা কালো সত্যকে কবিতায় মুখোমুখি দাঁড় করানোর প্রতিবাদ সেখানে রাজনীতিক বা সামাজিক প্রতিবাদের ভিন্নতায় যৌনমুক্তির প্রতিবাদও চিহ্নিত হল।

হাংরি চিহ্নিত দেবী রায় কিন্তু লিখলেন সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষেরই কথা—

'তুমি কিছুতেই পোষ মানাতে পারবে না—
মহারাজ
আমার কাঁধের পাশে ঝুলন্ত দুটো হাত
একে তুমি সহজ ভেবো না হে
এই দুটি মানুষের হাত
একে তুমি সহজ ভেবো না'

আর বিতর্কিত 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এর লেখক মলয় রায়চৌধুরীর প্রতিবাদ হয়ে উঠল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জেল অভিজ্ঞতায় থার্ড ডিগ্রী অত্যাচারের এক সরাসরি বয়ান—

'আবলুশ অন্ধকারে তলপেটে লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ি
পিছমোড়া করে বাঁধা হাতকড়া স্যাঁতসেতে ধুলো ভরা মেঝে
আচমকা কড়া আলো জ্বলে ওঠে চোখ ধাঁধায়
তক্ষুণি নিভে গেলে মুখে বুটজুতো পড়ে দু'তিনবার
কষ বেয়ে রক্ত গড়াতে থাকে টের পাই।' (আলো)

হাংরি আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা শৈলেশ্বর ঘোষ। প্রতিষ্ঠান বিরোধি তাঁর প্রতিবাদের ভাষা নির্মাণ করলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে, আপোষহীন প্রতিবাদের এই ভাষা সমাজের অন্ধকারের ভাষা। যে অন্ধকার সমাজ বিরোধীর, সমাজপতিতার, সমাজের অবহেলার বীজ হয়ে যারা 'আমাদের এই বীজক্ষেত'—শিরোনাম কবিতার বই-এর থেকে এই চিহ্ন প্রতিবাদ স্বরূপ উক্তি—

'স্বাধীনতার দখল ধুয়ে যায় একদিন, ক্ষুধা হয় মর্মের ঘুন
ধর্ষিতাও হেসে ওঠে শরীরে পায় যখন নিসর্গের ভ্রূণ'
(আমাদের বীজ ক্ষেত)

অথবা,

'যে নির্জনতা বেছে নিয়েছিলাম সেখানে কেন এত কোলাহল
বেশ্যা চোর আর সন্ন্যাসীর মধ্যে শুরু হয়েছে নিঃশব্দ চলাচল'।

ক্ষুধার্ত আন্দোলনের প্রতিবাদী চেতনা সমাজের পুঁজ-রক্ত ঘাম কে তুলে আনে, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ, আপোষকামী রুচিকে, চ্যালেঞ্জ জানায় কৃত্রিম সভ্যতার মেরুদণ্ড কাঁপিয়ে দেয়, তার আহ্লাদী চামড়া ভেদ করে যা হাড়-মজ্জার বুনিয়াদ ভেঙে দেয়।

সভ্য সমাজেরই এক অংশ গণিকালয়, চিহ্নিত লালগ্রহের নির্বাসিতা নারীদের ঠিকানা। এই পতিতাসমাজ মূলস্রোত মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অথচ অবিচ্ছেদ্য যৌনতার অনুষঙ্গে। বিরল কবি অরুণেশ ঘোষের কবিতায় অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে সেই সব গণিকারা, নিম্নবর্গীয় মানুষেরা, উন্মাদ, ভিক্ষুক, চোর, সমাজের এক অপর শ্রেণী । রয়েছে এক অধ্যাত্মিক বিকল্পে—

'প্রতিটি মধ্যরাতে তোমাকে পেরুতে হয়
নরক ও নক্ষত্রলোকের নদী, কোথায় স্পষ্টতা
হেসে, বাঁ হাতে সরিয়ে দাও সব হা হাস্যকর
শুধুই একটি আঙুলে স্পর্শ করো মাটি।' (শব ও সন্ন্যাসী)

এই ভাবে প্রতিবাদে প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে ওদের নারকীয় যন্ত্রণা প্রকট বাস্তব ছবি।

'তীব্র হাতগুলি ডুবে যায় রক্তে—রক্তের ভিতরে—আর তুলে আনে
তুলে আনে মুঠো মুঠো সিফিলিস জীবাণু....'

সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক সাইবারবিশ্বে। এখনও নিষিদ্ধ এক প্রান্তরে লালবাতির ঘেরাটোপে নির্বাসিত পতিতাসমাজ। সমাজের মূলস্রোত থেকে দূরে—'পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখের' ক্ষত নিয়ে বাঁচে। সময়ের স্বর প্রতিবাদের আত্মা খোঁজে প্রাসঙ্গিকতায়।

অগ্নিগর্ভ সত্তর দশকের সময় ও পটভূমি বদলের প্রাকপর্বে যে সব প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার স্বর বদলে দিচ্ছিল আবহমানের শিল্প চেতনার ধারা। সে সময়ের সেই কণ্ঠস্বর এক স্ব-বিদ্রোহ প্রতিবাদী কণ্ঠ যখন অস্তিত্ব বিদ্রোহের নামান্তর হয়ে যায় কবিতা ফাল্গুনী রায়ের নির্মাণ বিনির্মাণে হয়ে ওঠে এক আত্মধ্বংসী ক্রিয়াপদ—

'আমি খৃষ্টমূর্তির গায়ে লটকে দিয়েছি কৃত্রিম সাপ
আমি বাবা মার ভালোবাসার আড়ালে যৌন বনিয়াদ
আমি ক্রিয়াপদ পরিহার করতে চেয়েও ফিরে আসছি
ক্রিয়াপদের কাছে—' (নষ্ট আত্মার টেলিভিশন)

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা আত্মধ্বংসী কবিতার স্বর যেভাবে এক ঘোষিত বিদ্রোহ, কবির জীবনযাপনও নিয়মের ঘেরাটোপ মুক্ত প্রচলিত ধারার বাইরে এক আগল ভাঙা

স্বেচ্ছাচারীর—অনন্যা রায়ের কবিতার ভাষাতে ছিল জটিল দর্শন, মেধার তীব্র বিচ্ছুরণ এবং অস্তিত্ব অনস্তিত্বের হেঁয়ালি যা প্রতিবাদের সূত্র হয়ে ওঠে।

'কবিত্ব ফবিত্ব আমার নেই। শুধু চাবুক আর চাবুক চিৎকার।
কাক তাড়ুয়ার মতো বেমক্কা নির্জন রাত্রি।
আর সামনে ঝুলছে জায়মান অতীত
বরফের লিকলিকে হিম সাপের মতো
চিনা বাদামের নৈশব্দের মতোন...
কি অসহ্য এই পোড়ামাংস, এই মৃত্যু এই মদ...

সত্তর দশক এক আগ্নেয় সময়কাল। এক প্রবাহিত তরল আগুনের স্রোত গড়িয়ে সময়ের বুকে, কবিতার শিরা ধমনীতে। এপার বাংলা ওপার বাংলার মানচিত্রে।

এপার বাংলায় উত্তাল সত্তরের নকশাল আন্দোলন, ওপার বাংলায় একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধ—দুই-ই এক বিশাল পরিব্যক্তি নিয়ে শিল্প সাহিত্য কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল। এই দশক থেকে বহমান বাংলা কবিতায় বহুরৈখিক বহুমাত্রিক দিগদর্শন—প্রতিবাদের, মুক্তির, অর্ন্তজগতের, বহির্বিশ্বের এবং গূঢ় চেতনার পরাবাস্তাবতারও চমকপ্রদ স্বাক্ষরে। সময়কে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কোন সংবেদনশীল কবির পক্ষেই, দ্রোহকাল থেকে মুক্তির স্বপ্নে বিপ্লবের পথ হেঁটেছেন বহুকবি যেখানে কবিতা ও কবি এক সক্রিয় ক্রান্তিকালের শরিক হয়েছেন আর সেই ঘাতক সময়ের স্বাক্ষর বুকে নিয়ে শহীদ হওয়া দ্রোণাচার্য ঘোষ—সত্তর দশকের বাংলা কবিতার প্রথম শহীদ সম্মান নিয়েছিলেন বুক পেতে। বিপ্লবের স্বপ্ন এবং সক্রিয়তাকে ঝাঝাঁরা করে দিয়েছিল পুলিশের গুলি তার জেলবন্দী অবস্থায়। বিপ্লবের বিশ্বাস দৃঢ় প্রেথিত ছিল সে বুকে—

'মুঠিতে নিশান জ্বলে, মেহেনতী মানুষের রক্তের অক্ষরে
লেখা হয় দৃপ্ত এক মুক্তির শরীর'

অথবা,

'একটি সন্ধ্যা তার কাছে অন্তিম দীর্ঘশ্বাস
অন্ধকার রাতের সূচনা। তবুও এই রাত ভেঙে, সুদ ভেঙে
তেলেঙ্গানার কৃষক বলেছে মুক্তির পথ
নকশালবাড়ির রোদ, উপায়
সশস্ত্র সংগ্রামে দৃঢ় আলোর উদ্ভাস
জনতার গূঢ় সংগঠনে
মুক্তি তার হেসে উঠবে উজ্বল চরিত্রে।'

তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন—রক্তের গভীরে তার বিপ্লবের বিস্তার ছিল প্রতিবাদের প্রবাদ সত্য।

সত্তরের দশকের আগুনে দিনগুলি যখন বুলেট বারুদ বোমা, পুলিশের কালো ভ্যান, অলিতে গলিতে ও গুলিবিদ্ধ তরতাজা যুবকের লাশ, হত্যা প্রতিহত্যার মহড়ায় সন্ত্রস্ত সতর্ক। সাধারণ মানুষের দমচাপা ভয়, নিরাপত্তাহীনতায় দিশেহারা সমাজ, কবিতা তার সমস্ত মেদুরতা স্বপ্ন আবিলতা রোমান্টিকতা থেকে মুক্ত হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবাদের নানা আঙ্গিকে। 'রাজনীতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, কবিতা করেনি'—এখনই লিখেছিলেন তিনি দশক চিহ্নিত ব্যাতিক্রমী মুখোশহীন প্রতিষ্ঠান বিরোধী, এক সময়ের উচ্চারণে তাঁর স্বপরিচিতি—'আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি?' তিনি এই বিপ্লবের স্বপ্নভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতা থেকেই নির্মাণ করেছেন কবিতার প্রতিবাদ। যন্ত্রণা রক্তমেদ মজ্জা, হৃদয় মনন চেতনা থেকে প্রত্যক্ষ দেখার চোখ থেকে। বরানগরের গঙ্গার জল থেকে ভেসে ওঠা তিনশো যুবকের লাশ, অথবা বিপ্লবভঙ্গের শহীদ কবি, অথবা সমসময় বারুদ বুলেট বোমা হত্যা প্রতিহত্যার মহড়া দেখার অভিজ্ঞতায়—

'ধরো সেদিন এমনই রাত, জালিয়ানওয়ালাবাগে
ডায়ারের বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে
দ্রোণাচার্য ঘোষ
ভাবো; সেদিনের উৎসব। বরানগর গঙ্গার জল থেকে,
আবার এসেছে উঠে তিনশো তরুণ।'

বহুমাত্রিক তাঁর কবিতায় এ প্রতিবাদের কবিতায় সময় ইতিহাসে বিপ্লব এবং তার ব্যর্থতা নাশকতাভাস্বর হয়ে থাকে পংক্তিময়।

অন্তর্লী মেধার জগতের কবি তিনি—'কবিতা ছাড়া কোন প্রভু নেই কবিতা ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই...' এমন পংক্তি লেখেন কবি সুব্রত রুদ্র চেতনার গভীর বিশ্বাস থেকে। তবুও সামাজিক রাজনৈতিক নৈরাজ্য, রাজনীতির চক্রান্তে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার পরিহাসে দেশে সমাজে মানবিকতার যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হল সরাসরি উঠে এলো কবিতায়—

'মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে
ভারত ছাড়ো রাজনীতিকরা ভারত ছাড়ো...
দেশের জীবনীখানা ফেরত চেয়ে পাঠালাম
পুণ্যতীর্থে ভয় জাগে তোমাদের দেখে।...
সেটা ছিল বিশ্বাসের কাজ সকালে ভোরের আলো
তার' হ'লো ধনুষ্টংকার।'

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'—এরই বিবর্তন প্রাসঙ্গিক সময়ের বিশ্বাসভঙ্গে স্বৈরাচারী মানুষের তৈরী নৈরাজ্যে। রূপক চিত্রময়তায় রহস্য উপমায় সত্তরের অন্যতম কবি শ্যামলকান্তি দাশ, সময়ের অভিজ্ঞতায় আগুনের দিনরাতকে প্রত্যক্ষ করেছেন দশকের নির্মমতায়। গ্রাম জীবন তার কবিতার অনুসঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। তিনি জানেন গ্রাম শহরে বৈষম্য, শোষণ বঞ্চনা দারিদ্রের অভিশাপ। খিদের আগুন থেকে বিপ্লবের আগুন তাঁর কবিতায় এক এক প্রাসঙ্গিকতায়—

'...বনে জঙ্গলে পেটে ভাত নেই।
মেঘের শব্দে তাঁবু ফালাফালা
পাহাড় লাফায়
আমরা ছিলাম সেতুর আড়ালে
ঝর্ণার জলে বাঘের থাবার
পেটে ভাত নেই।'

গ্রাম জীবন, সুন্দরবন। মধুর খোঁজে জঙ্গল গভীরে বাঘের শিকার হয়ে যাওয়া জীবনযুদ্ধের মানুষ। কন্দ কচু পোড়া, ঝলসানো ইঁদুর, শামুক গেড়িগুগলি খাওয়া আধপেট মানুষ সমসময়েরই ছবি, সংবাদে পড়ি ছবিতে দেখি। কবিতায় পংক্তিতে এরাই হয়ে ওঠে প্রতিবাদ। যে প্রতিবাদ সময়ের আল বেয়ে তেভাগা থেকে নন্দীগ্রামের মাটিতে, চাষীর রক্তেভেজা ধানে—

'সেই ধানের চক্ষু ওপরানো
রাস্তা কাটা, থেঁতলে যাওয়া ধড়
সোনার গাঁয়ে মানুষ নেই আর
উড়ছে ধোঁয়া, রক্তে ভেজা খড়।

রূপক চিত্রময়তায় আড়ল সরিয়ে প্রবাদসম পংক্তি যেন এক ফ্রিজশট।

'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না—' প্রবাদ প্রতিম এই কবিতাপংক্তি ও নবারুণ ভট্টাচার্য সমার্থক মিথ হয়ে আছেন প্রতিবাদী কবিতায়। নকশাল বাড়ি আন্দোলন, সত্তরের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তধারা, গণপ্রহারের বীভৎসতা, শিরচ্ছেদ প্রতিবাদের প্রয়োগে এই প্রবাদ পংক্তি অব্যর্থ অমোঘ হয়ে আছে,

'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না
এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না
এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না
এই রক্তস্নাত কসাই খানা আমার দেশ না'

প্রতিবাদে তিনি রাজনীতির রং দেখে নি দল মত বিশ্বাসের বাইরে অন্যায় অনাচার ত্রাসের রাজনীতিতে—প্রতিরোধ প্রতিবাদে স্পষ্ট নির্ভীক লিখেছেন। জনমানসকে সচেতন করতে অক্লান্ত তাঁর লেখনী—মুখোশহীন, আপোষহীন ভয়হীন—

'আমাকে হত্যা করলে বাংলার সবকটি মাটির প্রদীপে শিখা হয়ে ছড়িয়ে যাবো
আমার বিনাশ নেই'

প্রতিবাদের প্রবাদ পংক্তি তো কবিতার শিখা-ই যার আঁচে বেচে থাকে প্রতিবাদী সত্ত্বা যার আঁচে পরিশুদ্ধ হয় ক্লীবের ভয়।

'আগুন খেয়ে বড় হয়েছি সাপের বিষ খেয়ে...'

সমসময়ের প্রতিবাদ চিহ্নিত কবি জয় গোস্বামী-র এই পংক্তি থেকেই সময়ের গরলকে কণ্ঠে ধারণ করেন তিনি, সময়ের আগুনকে স্বর দেন কবিতায়। কবিতায় এবং সক্রিয় ভূমিকায় যেখানে শুধুমাত্র প্রবাদের মতো মুখে মুখে উচ্চারিতই নয়—প্রতিবাদ কবিতা দাঁড় করায় আত্মসমীক্ষায়। যে কবিতা লজ্জা দেয় রাজনৈতিক ঘটনা বিশ্লেষণের তরজায়। যে কবিতায় দেখার দৃষ্টিকে দেয় নিরপেক্ষ দর্শন পরিকল্পিত রাজনৈতিক ইন্ধনের চতুরতা নৃশংসতা-কে হৃদয়ঙ্গম করার উপলব্ধির স্তরে, যাতে মানবিক বোধ থেকে মানুষ বিরত হয় এই কুটিল খেলায় না জড়াতে।

সময়ের সব সন্ত্রাস, নকশালের আগুন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ধোঁয়া, গুজরাট গণহত্যার দাউদাউ শিখা-নন্দীগ্রামের তুষচাপা ধিকি ধিকি জলন্ত আগুনকণা যখন সব গ্রাস করেছে তাঁর কবিসত্তা, তাঁর প্রতিবাদ লেখনীর এক এক প্রবাদ পংক্তির সে আগুন আঁচ কবিতায়—

'এখনো এখনো যদি ঘরে বসে নিজেকে বাঁচাই
যদি বাধা না-ই দিই, তত্ত্ব করি কি হল কার দোষে
যদি না আটকাই, আজও না ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি,
আমার সমস্ত শিল্প আজ থেকে গণহত্যাকারী!'

গুজরাট দাঙ্গায় লেখা এ আগুনের আঁচে পুড়ে যায় সন্ত্রাসের নন্দীগ্রামের মানুষের পালক—

'তারপর মেপে দ্যাখো কে বেশি কে কম
তারপর ভেবে দেখ কারা বলেছিল জীবন নরক করব,
প্রয়োজনে প্রাণে মারব প্রাণে!
এই বলে ময়ূর আজ মুখে রক্ততুলে

নেচে যায় শ্মশানে শ্মশানে...'
আর সেই নৃত্য থেকে দিকে দিকে ছিটকে পড়ছে জলন্ত পেখম।

নাশকতার হুমকি-কে প্রতিবাদের প্রবাদ পংক্তিতে দিলেন আগুনের ভাষা।

এক এক অগ্নিগর্ভ দশক থেকে নাশকতা থেকে তুলে নেওয়া, আগুনে পোড়া পেখম, ঝলসানো অক্ষর তুলে রাখি সযত্নে, যদি সময়ের বহমান চিহ্নে, যদি প্রজন্ম তাকে দেয় স্বীকৃতি। প্রবাদ পংক্তি তো এক সচেতন পরিত্রাতা, কবির অক্ষর ধ্বনির সঙ্গে যে বেজে ওঠে সময়ের নির্ঘিণ্টে, মহাকালের স্থানাঙ্ক নির্দেশে প্রতিবাদী স্বর যখন চিনে নেয় সময়কে, সে সময়ের অবস্থান তার নৈরাজ্য হিংসা অথবা আগ্রাসী ভূমিকাকে যথাযথ রূপ দেয় সরাসরি লেখা পংক্তি বিশেষণ।

যেভাবে মনিপুরের সেনা ব্যারাকে ধর্ষিতা মনোরমার জন্য মণিপুরের তাবৎ নগ্ননারীদের মিছিল এক ঐতিহাসিক ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিহ্নে সাক্ষরিত হয়ে আছে। সুবোধ সরকারের সেই প্রতিবাদ পংক্তি চেতনাবিশ্বে সাড়া জাগিয়েছিল—

'উঠে দাঁড়ান মণিপুরের মা
উঠে দাঁড়ান নগ্ন হয়ে স্তন্যদায়িনীরা
পৃথিবী দেখ্ মায়ের বুকে ক'খানা উপশিরা!
কেমন লাগে নগ্ন হলে তোর নিজের মা?' (মণিপুরের মা)

প্রতিবাদ শিল্পের এক বিশাল পটভূমি জুড়ে যেভাবে এপার বাংলা ওপার বাংলার সত্তর দশক স্মরণীয় হয়ে আছে—রাজনীতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। সেভাবেই ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ও বরাক এক স্মরণীয় রক্তাক্ত অধ্যায়। শুধুমাত্র মাতৃভাষা কেড়ে নেবার চক্রান্তে প্রতিরোধ যখন তৈরি হয় বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং বরাকের ১৯শে মে-র মতো রক্তাক্ত দিন। বাংলাদেশের পাঁচজন এবং বরাকের এগারো-টি তরতাজা প্রাণের বিনিময়ে সেসময় রক্ষিত হয় মুখের ভাষা অধিকার। ২১শে ফেব্রুয়ারীর সেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 'মাতৃভাষা দিবস'-কে নিয়ে দুইবাংলায় রচিত হয় অসংখ্য গান কবিতা সাহিত্য—তবে বরাক সেই প্রতিবাদ শিল্পে এক অনুজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রইল কবিতা সাহিত্যে।

তবে বরাকের কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতায় এক সরাসরি প্রতিবাদী আক্ষেপ রয়েছে শহীদের ভাষা উৎসর্গীত প্রাণের জন্য।

দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুলবোন কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল

'এই যে ঈশান কোণ
কোন ভাষাতে হাসে কাঁদে, কান পেতে তা শোন'
শুনলি না তো এবার এসে কুচক্রীর ছা

তিরিশ লাখের কণ্ঠভেদী আওয়াজ শুনে যা
'বাংলা আমর মাতৃভাষা ঈশান বাংলা'

২১শে ফেব্রুয়ারী নিয়ে কবি ও কবিতার অভিমুখ যেভাবে আবেগে প্রতিবাদে সক্রিয় ভূমিকায় ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল তা প্রায় এক বিপ্লবের ভূমিকায় বিশ্বের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য।

জনসাধারণ থেকে কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক এমনকী তদানীন্তন বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কবিতা পংক্তি চিহ্নিত হয়ে আছে সে রক্তাক্ত অধ্যায়ে—

'বাংলার মুখ দেখো
অসংখ্য মানুষের মুখে
সেখানে অসংখ্য তারার মতো জ্বলে
আমদের রক্তে ভেজা অ আ ক খ
মাগো তুমি জন্ম দিলে
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমার আত্মায় স্বপ্নে রক্তের ভেতর।'

(আমাদের রক্তে ভেজা অ আ ক খ)

যেভাবে লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরী-র রচিত গানের সেই অমর পংক্তি মালা—

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া
এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।'

কোন দশকেই সীমাবদ্ধ করা যায় না বাংলা কবিতার অক্লান্ত যোদ্ধা শামসুর রহমানকে। যতদিন বাংলা ভাষা ততদিন শামসুর রহমান উচ্চারিত হবেন প্রতি এক মুক্তির ডাকে, প্রতি আন্দোলনে। ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ৭০ অসহযোগ, ৭১ মুক্তিযুদ্ধ—তার প্রবাদপ্রতিম কবিতা পংক্তি কিংবদন্তী হয়ে আছে—

হে আমার আঁখি তারা তুমি উন্মীল সর্বক্ষণ জাগরণে।
তোমাকে উপড়ে নিলে বলো তবে কী থাকে আমার?

উনিশশো বাহান্নর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি।
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।'

(বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা)

রক্তে ভেজা স্বদেশের মাটি আর রক্তাক্ত শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যে প্রতিবাদী এই স্মরণধার্য্য পংক্তি—এক মহার্ঘ প্রতিবাদ শিল্প। তিনি লিখলেন 'আসাদের শার্ট' বা 'সফেদ পাঞ্জাবী', গেরিলা-র মতো রক্তে সাড়া জাগানো সব কবিতা। যা ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকদের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল।

'আসাদের শার্ট' আজ আমাদের প্রাণের পতাকা'—যদি হয় শহীদের আত্ম উৎসর্গের এক প্রেরণা তবে—

'সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ তাড়ানিয়া
তুমি তো আমার ভাই হে নতুন, সন্তান আমার।

'গেরিলা' কবিতার এই ছত্রে রয়েছে বিপ্লব এবং বিপ্লবীর প্রতি এক মমত্বময় অনুপ্রেরণা।

পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তর দশক এক ক্রান্তিকালের সময়। ধর্মীয় দ্বিজাতিত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদ থেকে শুরু করে এই কবি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতাকামী সময়কাল অব্দি কবিতায় সক্রিয়তায় একাত্ম হয়ে রয়েছেন। লক্ষাধিক মৃত্যু, ধর্ষণ, অরাজকতা, রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়া হত্যা, গেরিলা যোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাদের এক বর্ণময় অধ্যায় হয়ে রয়েছে। যেভাবে সেই স্বাধীনতা পর্বের প্রবাদ পংক্তি—

'তোমাকে পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডব দাহন?....এই বাঙলায়
তোমাকেই আসতে হবে হে স্বাধীনতা।

(তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা)

পরাধীনতা মুক্ত স্বাধীনতা স্বাধীন বাংলার এক যুগ পর্ব। এ পর্ব জুড়ে কবিদের বিদ্রোহী অনুভূতির বিস্ফোরক পংক্তি ও প্রতিবাদ সাহিত্যের এক স্মরণযোগ্য প্রবাদ হয়ে আছে।

সত্তর দশকেই লেখা রফিক আজাদের বিস্ফোরক কবিতা 'ভাত দে হারামজাদা'—

ভীষণ ক্ষুধার্ত আছি উদরে শরীরবৃত্ত ব্যাপে
অনুভূত হ'তে থাকে—প্রতিপলে—সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো।

কবি নির্মলেন্দু গুণ যেভাবে ভাষা আন্দোলনের উপলক্ষে লিখেছেন 'একুশের কবিতা'। আর ১৯৭১ এ লিখেছেন মুক্তি যুদ্ধের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুকে নিয়ে। নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৭৫—১৫ই আগস্ট। তাৎপর্যপূর্ণ এই দিনটিতে বর্বর হত্যাকাণ্ডে মৃত এই স্বাধীন বাংলার স্থপতিকে নিয়ে সে সাহসী প্রবাদ পংক্তি—

'শহিদ মিনার থেকে খসে পড়া একটি রক্তাক্ত ইট
গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায়
শেখ মুজিবের কথা বলি
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।'

বাংলাদেশের বাহান্ন এবং সত্তরের এই রক্তাক্ত পটভূমি জুড়ে যে সব প্রতিবাদী পংক্তি মালা যেখানে প্রতিবাদের ব্যঞ্জনাকে যদি এক ভিন্ন অভিমুখে দেখি তবে আলমাহমুদের কবিতায় প্রতিবাদ চিহ্নিত হয় প্রতি এক ছত্রে যে ভাবে 'কবিতা এমন'—

'কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর
ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল নিশান
চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে
নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা
... ...
কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুল খোলা আয়েশা আক্তার।'

বাহান্ন-র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় তিনি, দ্বিখণ্ডিত বুকের রক্তের স্বাধীনতা, ছিন্নমুলের যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সবই পংক্তিময় প্রতিবাদের তির্যকে রয়েছে এই প্রবাদ কবিতায়। আর সমকালীন এক বিজাতীয় হিংসার ঘটনায় দারুন সামাজিক হয়ে রয়েছে তার কবিতার শেষ পংক্তি। খোলাচুল যেখানে নারী স্বাধীনতার এক মূর্ত প্রতীক, সেখানে এই প্রযুক্তি শতাব্দীর সভ্যতায় শুধুমাত্র মেয়েদের মাথাঢাকা হিজাবের প্রতিবাদে কথা বলায় খুন হয়ে যেতে হয় রাজশাহীর এক অধ্যাপককে। কবিতার প্রবাদ পংক্তি কী তবে এই সমসময়ের সমাজের কাছে কোন বার্তাই বহন করে না?

এই মুহূর্তের বাংলাদেশ এক নবজাগরণের প্রতিবাদী দশক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে শাহবাগ আন্দোলনের ভিত্তিতে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আঁচ নিয়ে বাহান্নার ভাষা আন্দোলনের শহীদের রক্তাক্ত স্মৃতি নিয়ে যেখানে এইসব প্রবাদ পংক্তিরা এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

প্রতিবাদী সাহিত্যে নারী বিশ্বের এক সামান্তরাল ক্ষেত্রে রয়েছে বহুমুখী প্রতিবাদী

কণ্ঠস্বরে যেখানে প্রতিবাদী স্বরের ওপর নেমে আসে রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, তর্জনী শাসন অথবা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বা পারিবারিক অদৃশ্য দেওয়ালে বন্ধ থেকে যায় যে স্বর। পৃথিবীর মানচিত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে যে রাজনৈতিক আগ্রাসণ তেমনি ভাবেই নারী বিশ্বের সামগ্রিক পরিকাঠামো আরও করুণ এবং ভয়াবহ। পুরাণের মিথকল্পে দ্রৌপদী সীতা অহল্যা বেহুলা থেকে সমকালের বহু নৃশংস ঘটনায় মনোরমা অহল্যা তাপসী মালালা নির্ভয়া অপরাজিতার নাম জড়িয়ে আছে এক এক ঘোষিত প্রতিবাদের অঙ্গনে। গৃহাঙ্গণে বহিরাঙ্গণে নির্যাতিতা পতিতা ধর্ষিতা মৃতা হতে হতে প্রতিবাদের সক্রিয় ভূমিকা এবং স্বর চিনে নেয় সময়কে।

যেভাবে এক বিদ্রোহী নারীর ভূমিকাকে নির্দেশিত করেন কবিতা সিংহ। প্রথম বিদ্রোহিনী নির্বাচিত করেন সৃষ্টির আদি নারী ইভ্‌কে—'ঈশ্বরকে ইভ্ কবিতায়।'

'আমিই প্রথম।/জ্ঞানবৃক্ষ ছুঁয়েছিলাম/....আমিই প্রথম।
সোনার শিকল/আমিই প্রথম ভেঙেছিলাম/...আমিই প্রথম
বিদ্রোহিনী/...জেনেছিলাম/স্বর্গেতর/মানব জীবন/জেনেছিলাম/আমিই প্রথম'

মানবিকতার দাবী আদায়ে সেই প্রথম নারীর মুখ। প্রতিবাদেই পৃথিবীর 'গভীর অসুখের' সমতুল্য পংক্তি লেখেন যে মৌনপুতুল নারীর অসুখের কথায়—

'আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ
জানলে না কাটামুণ্ডে
ঘোরে এক বাসন্তী অসুখ' (না)

এক অনমনীয় জেদে বিদ্রোহে, মেয়েদের প্রতিবাদী চেতনায় পংক্তি রোপন করেন—

'এভাবেই পথ, বন্ধ দরোজা গমন হয়
পথ মানে জিদ/
জিদ্ মানে এক যাওয়ার জয়...'

কবিতা সিংহেরও আগেই মেয়েদের পরাধীনতার যন্ত্রণা রাজলক্ষ্মী দেবীর—উপলব্ধিতে হয়ে ওঠে প্রবাদেরই এক ভিন্ন কথণ—'

'ঘুমাতে পারি না কেন? রাত জাগি সূর্য জ্বলে চোখে
চারিদিকে অন্ধকার, পুড়ে মরি নিজের আলোকে' (প্রত্যাবর্তন)

নারী স্বাধীনতা আদায় করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক নারীদিবসের দাবীতে ঘোষিত, ৮ই মার্চ দিনটি নারী মুক্তি দিন, নারীর খোলা আকাশের ঠিকানা। অর্ধেক আকাশের দাবীদার নারী। কিন্তু সময়কাল জুড়ে যে গভীর অন্ধকার হতাশা—'অদ্ভুত আঁধার' ঘনিয়ে আছে

তার জন্ম মৃত্যু বিবাহে, কর্মজীবনে, স্বাধীন সত্তার পূর্ণ প্রকাশে! কন্যা ভ্রূণ হত্যা, বধূ হত্যা, ডাইনী হত্যা, ধর্ষণে হত্যা যেন জন্ম আর মৃত্যু-হত্যা নির্দেশিত হয়ে আছে সামাজিক পরিকাঠামোতে রাজনৈতিক সামাজিক পারিবারিক প্রতিশোধ হিংসা লালসা চরিতার্থতার জন্য যেন নারী। এমন সহজ অনায়াস মৃগয়ার ক্ষেত্র আর হয় না!

'বিচিত্র কৌশলে/ব্যাধেরা ছলনা করে। শোন সখী সোনা,
এ আমলে/ বিশ্বস্ত হরিণী হতে নেই। এই ভীষণ অশ্লীল/
অরণ্যে আমরা চারুচিত্রিত চিত্তের গন্ধে লীন; (সখী সংবাদ)

প্রাসঙ্গিকতায় এ প্রবাদকল্প পংক্তি—তুলনা রহিত প্রতিবাদের কণ্ঠ আর নারী অস্তিত্ব তাঁর আত্মায়, ঘুমে-জাগরণে। মিথ্ পুরাণের কল্পচিত্র থেকে সাইবার প্রজন্মের নারীর সহ্য করে চলা অন্যায় শৃঙ্খল ব্যাথা অবিচার নির্মমতা সব প্রতিবাদে ঝলসে উঠছে তাঁর কবিতায়, সক্রিয় আন্দোলনের ভূমিকায়, স্পষ্ট তীব্র নারীকণ্ঠের প্রতিভু মুখোশহীন কবি কৃষ্ণা বসুর তরবারী তীক্ষ্ণ কলমে—নারীর অস্তিত্বের শিকড়, নারীর ভিত্তিভূমি, তার স্বকণ্ঠ তার স্বদেশ তার নিজস্ব ঠিকানার সন্ধানে পংক্তি বিশেষ—

'মাগো বলো আমার নিজের বাড়ী কোনখানে আছে?
মেয়েদের নিজেদের বাড়ি থাকে কোন দিন?'

অথবা 'কন্যা ভ্রূণ' হত্যার আশঙ্কায় এক হত্যাভাগ্য মা—যেভাবে তাঁর মর্মস্পর্শীতায়—

'গর্ভের ভিতের তার প্রাণকণা নড়ে চড়ে আজ
ভয়ে হিম হয়ে আসে রক্ত তার শেষে....'

আর পুড়ে যাওয়া দগ্ধ বধূর লাশ, ধর্ষিতার লাশ অথবা কুমারী মায়ের লাশ তার 'মেয়েমানুষের লাশ' কবিতায় প্রবাদ প্রতিবাদে এক মিথ্ হয়ে আছে—

'সাঁকোর কিনারে এসে আটকে আছে লাশ
মেয়েমানুষের লাশ...
তার মুখ ফেরানো রয়েছে সন্তানের দিকে
তার মুখ ফেরানো রয়েছে সংসারের দিকে
তার মুখ ফেরানো রয়েছে পুরুষের দিকে'

এ যেন আবহমানের নারী। প্রেমিকা, বধূ, মা সংসারকে সৃষ্টিকে যে বেঁধে রাখে মায়া দিয়ে, পালন করে শক্তি দিয়ে অথচ সমাজ সংসার সন্তান যখন নির্দয় হয়ে ওঠে নৃশংস মায়াহীন সংসারে নারীর ভাগ্যলিপি যেভাবে লেখা হতে থাকে তারই প্রবাদ চিত্র।

নারী বিশ্বের কথা অপূর্ণ থেকে যাবে মল্লিকা সেনগুপ্তর প্রতিবাদী স্বর ছাড়া যেখানে

পৌরাণিক রাজনৈতিক সামাজিক আর্থিক এবং নারীর অস্তিত্ব সংকটের কথা দ্ব্যর্থহীন' পংক্তিতে পংক্তিতে—

'আমরা তো জানি পৃথিবী রমনী আকাশ আদিমপুরুষ তবে কেন তুমি আমার দু'হাতে শেকল পরিয়ে রেখেছ হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি?'
অসূর্য্যস্পর্শী নারী থেকে আধুনিক নারীর অবস্থানিক পরিবর্তন ঘটছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সভ্যতার নিরিখে তা কতটা স্বাধীন নিরাপদ পংক্তি সে কথা বলে

হে পুরুষ!
রূপ দেখলেই কেন হাতের মুঠোয় চাও জ্যান্ত মানবীকে
না পেলে তারই শাড়ি টেনে ধরে অশ্লীল হাসিতে
তার মুখ কালো করে দিতে চাও? (দ্রৌপদী জন্ম)

শৌখিন কবিতার পেলবতা থেকে দুরেই থাকে তার নারীর ভূবন কারণ যে নারী কবির প্রেরণা তাকে হতে হয় ইভ্‌টিজিং ধর্ষণ অথবা এ্যাসিড হামলার শিকার। নারী যদি প্রশ্ন রাখে পুরুষের কাছে সমাজের কাছে সময়ের কাছে—

'ভুলতে পারিনা তবুও প্রথম আগুন জ্বেলে তুমি
বলেছিলে ঘর বাঁধো তুমি ছিলে উষার মিছিলে
মিছিলে তুমিই দস্যু তুমি ত্রাতা তুমি যাযাবর।'

আবহমানের লিঙ্গভিত্তিক দ্বিচারিতা থেকে পুরুষ কে এই প্রশ্ন। এক চিরায়ত প্রেমিকা বধূ মাতা কন্যা নারীর যৌনতত্ত্বের মিথ্ ভেঙ্গে বা রাজনীতিক প্রেক্ষাপটে বা এক সাধারণ শ্রমজীবী নারীর স্বরকেও তুলে এনেছেন কবিতার প্রতিবাদে—

'গৃহাশ্রমে মজুরি হয় না বলে মেয়েগুলি শুধু
ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত বেঁধে দেবে...
আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?

প্রবাদসম এ পংক্তির উত্তর দেবে কোন সময়, সমাজ, নীতি? নারী বিশ্বের অর্ধেক আকাশ জুড়ে যে সব নক্ষত্র প্রতিম প্রবাদ পংক্তিরা যা রয়েছে তার অধিকাংশই 'মেঘে ঢাকা তারা' সমাজ সংসারে এর প্রয়োগে চেতনা বিশ্বের দরোজা যে বন্ধই রইল!

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বহু কবিতা পংক্তি ও কবি সম্পর্কিত তথ্য কবিসম্মেলন পত্রিকা ও অসংখ্য লিটিল ম্যাগাজিনের আলোচিত কবি ও কবিতা থেকে সংগৃহিত।